কবি হওয়ার গল্প

হুমায়ুন আজাদ

কখন প্রথম মেঘ জমতে জল পড়তে পাতা নড়তে রূপ জ্বলতে সুগন্ধ উঠতে শুরু করেছিলো আজ আর মনে নেই, না থেকেই ভালো হয়েছে; যে-স্বপ্ন মনে থাকে, ঘুমের ঘোরে হারিয়ে যায় না, তা স্বপ্ন নয়। আজ রূপান্ধ হয়ে তাকালে শুধু দেখতে পাই দৃশ্যের পর দৃশ্য, স্বরের পর স্বর; সুগন্ধে ভরে উঠে আমার মাংস। কবিতা হয়তো ঢুকেছিলো রোদ হয়ে মেঘ হয়ে ঝড় হয়ে কুয়াশা হয়ে পুকুরের ঢেউ হয়ে বই হয়ে; কবিতা আমার ভেতর ঢুকেছিলো নিঃশব্দে।

রাড়িখালে, আমাদের ওই জল বন্যা ঘাসের সবুজ ধানখেত মেঘ বৃষ্টি ঘেরা পল্লিটিতে, এর আগে কারো কবি হওয়ার সাধ জাগে নি। না কি জেগেছিলো? আমি জানি না, কেউ জানে না। কতো শতাব্দী কেটে গেলে একটি গ্রাম একজন কবি জন্ম দেয়ার স্বপ্ন দেখে?

আমার বাল্যকাল ছিলো আকালের, চারদিকে সব মুখই ছিলো ভাঙা; তাদের ভাঙাচোরা মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হতো না তাদের ভেতরে, অনেক ভেতরে, যেখানে চলে কম্পন যেখানে জ্বলে স্বপ্ন, ভাতের ধানের স্বপ্ন ছাড়া আর কোনো সোনার জন্যে স্বপ্ন ছিলো। কবিতার দরকার পড়েনি তাদের, কবিতা জাগেনি কারো বুকে, অনেকেই জানতোই না যে কিছু আছে কবিতা বলে; জীবনই ছিলো তাদের কাছে নৃশংস কবিতা। তবে তাদের ভেতর যে সুর ছন্দ রূপ রূপক উপমা উৎপ্রেক্ষা ছিলো না, তা নয়। জোলাবাড়ির ছিটু মা'র কাছে এসে দুপুরে মাটির পাত্রে চাইতো 'কালাগরুর দুধ', অর্থাৎ ফ্যান; তাকে আমার মনে হতো কবি, যে ক্ষুধার মধ্যেও রূপময় রূপক দেখতো। আমার মনে হয় ক্ষুধার রাজ্যেও পৃথিবী কবিতাময়; মানুষ শুধু গদ্যে বেঁচে থাকতে পারে না।

আমি চারপাশের সৌন্দর্য দেখেছি, ভরে উঠেছে আমার ইন্দ্রিয়গুলো; কিন্তু প্রকৃতির থেকেও অসাধারণ এক বিস্ময় এক সময় উপস্থিত হয় আমার সামনে—বই। বাঙলার কবিরা বই পছন্দ করে না, তারা ছিন্নবাঁধা পলাতক বালকের মতো, মাঠের রাখালের মতো বই থেকে দূরে থেকে সারাদুপুর তরুচ্ছায়ে বসে বাঁশি বাজাতে ভালোবাসে; আমার ভেতরে বাঁশি বাজিয়েছিলো বই। অবশ্য রাড়িখালে বই বেশি ছিলো না; সেখানে বই অর্থই ছিলো ইস্কুলের পাঠ্যবই। আমি ওই পাঠ্যবইয়ে পেয়েছিলাম কবিতাকে, যা আমাকে স্বপ্নাকুল করে তুলতো। পাঠ্যবইয়ে সাধারণত থাকে খুবই খারাপ কবিতা, পাঠ্যবই খারাপ কবিতাই পছন্দ করে; কিন্তু তার মাঝেও মাঝে মাঝে পেয়েছি এমন জ্যোৎস্না ও অন্ধকার, এমন সুখ ও হাহাকার, যা আজো আমাকে শিশিরে ভিজিয়ে দেয়। 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই', 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির', 'বর্ষার উৎসবে জেগে উঠে পাড়া', 'আমি হবো সকাল বেলার পাখি', 'ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা', 'সবচেয়ে যে ছোটো পিঁড়িখানি সেইখানে আর কেউ রাখে না পেতে', যে-কাঁপন জাগিয়েছিলো তা আজো মনে পড়ে।

আমাদের ইস্কুল, অন্য সব ইস্কুলের মতোই কবিতার কথা জানতো না; ইস্কুল জানতো নেতাদের, ধনীদের, শক্তিমানদের; এবং আমাদের ভেতরেও জাগিয়ে দিতো নেতা না হলেও ধনী হওয়ার স্বপ্ন। আমার ইস্কুল অন্য সকলের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিলো বাস্তবকে জয় করার বাসনা, সবাই জয় করতে পারেনি বাস্তবকে,

বাস্তব খুবই জঘন্য রাজ্য; শুধু একলা আমার ভেতরে জাগিয়ে দিয়েছিলো অবাস্তবকে জয় ও অবাস্তবের কাছে পরাজিত হওয়ার নিরন্তর অভিলাষ। স্কুলে স্যাররা কবিতা পড়াতেন, যেমন আজো পড়ান; কবিতা তাঁদের কাছে ছিলো সারাংশ আর ব্যাখ্যার বিষয়, তাতে যে সৌন্দর্য আছে, সেকথা কখনো বলেন নি তাঁরা। ছন্দ বলতে তাঁরা বুঝতেন চরণশেষের মিলকে। কিন্তু আমি দুলে উঠতাম চরণের ভেতরে ভেতরে, না বুঝে, মুগ্ধ হতাম রূপে, যদিও পাঠ্যকবিতায় রূপ ছিলো খুবই কম।

কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম কিশোর বয়সেই, সেগুলো কবিতা হয়নি।

একটি ভুল করেছিলাম ওই বয়সে, কবিতা পাঠাতে শুরু করেছিলাম ‘কচিকাঁচার আসর’ আর ‘মুকুলের মাহফিলে’। ছাপা হয়নি, তবে ছাপা হয়েছিলো আমার প্রবন্ধ। আজ বুঝতে পারি কিশোর বয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করা ঠিক নয়; এ-সময়ে যারা সফল হয়, পরে তারা হয় সাধারণত ব্যর্থ। আমার কিশোর বয়সে যাদের লেখা ছাপা হতো, নিয়মিত, বড়ো বড়ো অক্ষরে নাম ছাপা হতো যাদের, দেখে নিজের জন্যে কষ্ট হতো, তারা কেউ কবি হয়নি, লেখক হয়নি, হারিয়ে গেছে। যাঁরা হারাননি, তাঁরা বুড়ো বয়সেও লিখে চলছেন কিশোর বালকের মতো। তাঁদের বিকাশ ঘটেনি, তাঁরা বিশ্বের অসাধারণ শিল্পকলার সাথে পরিচিত হননি; তারা শিল্পকলা বোঝেননি, শুধু নাম ছাপিয়ে চলেছেন। ইস্কুলে পড়ার সময় পাঠ্যকবিদের ছাড়া যাঁদের নাম পেয়েছি পত্রিকায়, তাঁরা কবি নন পরে বুঝেছি; তখনো খারাপ জিনিসই গ্রামে যেতো, আজো যায়। তখন সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ বুদ্ধদেবের নাম শুনিনি, যাঁদের নাম শুনেছি তাঁদের কথা না বলাই ভালো। আজো ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা সাধারণত অকবিদেরই জানে কবি বলে।

গ্রামে ছিলাম সাড়ে পনেরো বছর আর প্রবেশিকা পর্যন্ত; কিন্তু আউলবাউল রাখালের বাঁশি আমাকে মুগ্ধ করেনি। প্রকৃতি আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু আমি কবিতার আউলবাউল রাখাল হতে চাইনি।

প্রবেশিকায় সবার স্বপ্নের থেকেও ভালো ফল করেছিলাম বলে উচ্চ মাধ্যমিকে আমাকে পড়তে হয়েছিলো বিজ্ঞান, ঢাকা কলেজে, যেটা আমার জীবনের নিকৃষ্টতম সময়। সেখানে শিখিনি কিছুই, কোনো শিক্ষক স্বপ্ন দেখাননি; শুধু শওকত ওসমান ছাড়া। ওই কলেজের শিক্ষকেরা এতোই নিঃস্বপ্ন এতোই প্রতিভাহীন, কীভাবে ছাত্রদের দেখাবেন স্বপ্ন, ভেতরে সঞ্চারিত করবেন প্রতিভা? কী হবো আমি, কী হবো? ইঞ্জিনিয়ার? কবি? লেখক? কতো যে ঘুমহীন রাত গেছে।

অভিভাবকদের খুব দুঃখ দিয়ে আমি ভর্তি হলাম বাঙলায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মনে হলো ফিরে পেলাম আমার রাড়িখাল উচ্চ বিদ্যালয়টিকে। বাধ্য হয়ে ঠিক করি খুব ভাল ফল করতে হবে, প্রথম শ্রেণী পেতে হবে, এবং হতে হবে কবি, পন্ডিত, সমালোচক, ও অনেক কিছু। সত্যিই এসব হতে আমার ইচ্ছে হতো, যেমন ছেলেবেলায় আমার হতে ইচ্ছে হতো বিদ্যাসাগর; কিন্তু এগুলো খুবই খারাপ, কেননা কবিদের প্রথম শ্রেণী পেতে নেই, পড়াশুনো করতে নেই; কবিদের হতে হবে আউলবাউল রাখাল প্রতিভা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও চারপাশে তখন চলছে কবিতার উত্তেজিত আধুনিক কামার্ত আন্দলন; লিটল ম্যাগাজিন বের করছে তরুণ কবিরা, প্রচ্ছদে বড়ো বড়ো করে নিজেদের নাম ছাপছে। কবিতা না লিখে কেউ কেউ দেখা দিচ্ছে গুরু হয়ে, অনেকে পংক্তিতে পংক্তিতে স্তন যোনি সঙ্গম লিখছে, শিশ্নের ছাপে ভরে ফেলছে কবিতা, বেশ্যালয়কে মনে করছে কবিদের বিশ্ববিদ্যালয়; ছুটছে লিটল থেকে অ্যাডালট ম্যাগাজিনে, দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীতে; লিটল ম্যাগাজিনে দিচ্ছে নিজেদের বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন।

আমি লিটল ম্যাগাজিনে যাইনি, অ্যাডালটেও যাইনি; দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদককেও ‘ভাই’ বলে ডাকিনি। কবিতার জন্যে সব কিছু ছেড়ে পথে পথে ঘুরিনি, গাঁজা টানিনি, বেশ্যাবাড়ি গিয়ে শিল্পকলার চরম রূপ দেখিনি। বাধ্য হয়ে ঘন্টায় ঘন্টায় আমি শিক্ষকদের নিম্নমানের বক্তব্য শুনেছি, আর পড়েছি বাজে বাজে পাঠ্য আর সহায়ক বই- অসহ্য শ্রীকুমার বন্দ্যো আর প্রমথনাথ বিশী, আর প্রেরণাজাগানো পশ্চিমের বই।

প্রচুর চা আর সিঙ্গাড়া খেয়েছি শরিফ মিয়ার ক্যান্টিনে; আর যে-তরুণ কবিদের কবিতা তখন সাড়া জাগাচ্ছে, দেখেছি তাদের উত্তেজনা।

উচ্চ মাধ্যমিকের মাঝামাঝি আমি কৈশোর থেকে ঢুকি যৌবনে, শুধু বয়সে নয়; অভাবিত বিস্ময়কর এলোমেলো করা সব লেখকদের লেখা পড়তে শুরু করি। জানতে পারি বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী আছেন, তাঁদের পড়ি, বুঝি এবং বেশিই বুঝি না; অনার্সে ঢুকে পাই পাউন্ড এলিয়ট বোদলেয়ার র‍্যাঁবো মালার্মে কিটস শেলি ও আরো অনেককে। বিশ্বটাই বদলে যায়। আমি পড়তে থাকি, কবিতা লিখি, প্রবন্ধও, সমালোচনাও—আমার সমালোচনায় তখন থেকেই ঢাকার সাহিত্যপালরা ক্ষেপে উঠতে থাকেন; তবে কবিতার জন্যে আমি তখন সবকিছু অস্বীকার করতে পারিনি, বাউল হয়ে বেরিয়ে যেতে পারিনি একতারা হাতে। আমাকে কবিকঙ্কনচন্ডীও পড়তে হতো-পরীক্ষার জন্যে, আবার পড়তে হতো র‍্যাঁবোকেও-নিজের জন্যে; পাগল হতে হতে আমাকে থাকতে হতো সুস্থির, ওই চাপ আমার সহযাত্রীদের ছিলো না। ওরা খুব স্বাধীন ছিলো সব দিকে; বেশ্যাবাড়ি যেতে পারতো স্বাধীনভাবে, আবার স্বাধীনভাবে লিখতে পারতো ভুল শব্দ বাক্য চিত্রকল্প, যা আমি পারিনি।

আমি গ্রহণ করি আধুনিকতাকে; আমি সৌন্দর্য আর তীব্র অগ্নিনাচের আবেগকে, মননশীলতাকে রূপান্তরিত করতে চাই সৌন্দর্যে। আমি লোককবি হতে চাইনি বলে প্রতিদিন কবিতা বাঁধি নি, পাগলামোকে কবিতা মনে করিনি; আমি কারো স্তব করিনি কবিতায়, না মহাপুরুষের না কোনো তন্ত্রের; আর ঐতিহ্য ঐতিহ্য শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো বলে আমি ওই জিনিসটাকে ছেড়ে দিই। শিগশিগ কবিতার বই বের করতে হবে, এটাও আমি ভাবিনি; কিন্তু স্বাধীনতার পর কবিতার বই বেরোনোর একটা চাঞ্চল্য এসেছিলো; আমার একটি বই—*অলৌকিক ইস্টিমার*-বেরোয়। কিন্তু বেরোনোর সাথে সাথে আমাকে চলে যেতে হয় অনেক দূরে, কবিতা ও স্বদেশ থেকে; কবিতার জন্যে আমি প্রচারকর্মের সময় পাইনি।

এডিনবরার তিন বছর আমি কবিতা থেকে দুরে থেকেছি, শুধু অনুবাদ করেছিলাম জীবনানন্দ ও আমার কয়েকটি কবিতা, বেরিয়েছিলাম লিডস বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকীতে। ১৯৭৬ পর্যন্ত আমার জীবনকে এখন আমি বাদ দিই, আমি মন দিয়ে লেখা শুরু করি ১৯৭৭ থেকে; কিন্তু ষাটকাব্যগ্রন্থের দেশে আমি কবিতা লিখেছি কমই, মাত্র ছ'টি কাব্যগ্রন্থ। আরো অনেক কিছু লিখতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু কবিকে কি লিখতে হবে হাজার হাজার কবিতা? আমার মনে হয় না। আমি ভেতরে ভেতরে কবিতা লিখে চলেছি, বাইরে বেরোতে সেগুলো; আমি লিখছি, যখন অন্যরা অতীত কীর্তির ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে উপভোগ করছেন নিজেদের গৌরব।

****

অনুলিখনঃ সুমন তুরহান। suman.turhan@yahoo.com.au